অভিনয় শিল্পী

সুলতানা জামান

জীবন ও কর্ম

সুচিত্রা সরকার

অভিনয়শিল্পী সুলতানা জামান : জীবন ও কর্ম

গবেষক
সুচিত্রা সরকার

তত্ত্বাবধায়ক
ইস্রাফিল শাহীন

সম্পাদক
কাজী সুফিয়া আখতার

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

মহাপরিচালকের কথা

অভিনয় শিল্পী সুলতানা জামান বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একটি অনন্য নাম। বিশেষ করে সামাজিক বাধা ও ধর্মীয় গোড়ামির কারণে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকে অভিনয়ের জন্য নারী শিল্পীর উপস্থিতি ছিল প্রায় অকল্পনীয়। সেই ঘোর দুর্দিনে অভিজাত মুসলিম পরিবারের সদস্য হয়েও চলচ্চিত্রা অভিনেত্রী হিসেবে পর্দায় আবির্ভূত হয়ে অন্যান্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সুলতানা জামান। তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা চলচ্চিত্রের পাশাপাশি কিছু উর্দু চলচ্চিত্র এবং বিজ্ঞাপনচিত্রেও অভিনয় করেন। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছেন। আজীবন তিনি সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা, অভিনয়শৈলী, জীবন ও কর্মের জন্য ২০০৯ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন আজীবন সম্মাননা। এদের মানুষের হৃদয়ে তিনি অভিনয় শিল্প হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

এ গবেষণায় অভিনয় শিল্পী সুলতানা জামানের বর্ণাঢ্য জীবনের বিস্মৃত-প্রায় সব অধ্যায়ের উন্মোচন করেছেন সুচিত্রা সরকার। তিনি তাঁর অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুলতানা জামানের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করেছেন। গবেষণারয় উঠে এসেছে তাঁর জন্ম, শৈশব ও শিল্পী হওয়ার সময় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট যা আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের বিভিন্ন পর্বকে বুঝতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র-সাহিত্য নির্মাণ ও বিকাশ, দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস উদ্ঘাটন, চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের বিভিন্ন পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবদান তুলে আনা, দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের দিকনির্দেশ এবং নতুন চলচ্চিত্র লেখক ও গবেষক সৃষ্টির লক্ষ্যে সমন্বিত গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্য সাধনে ও গবেষণার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা এবং নিবিড় মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরে আসবে।

ঢাকা
২১ জুলাই ২০১৪

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

সূচি

প্রথম অধ্যায়

শুরুর কথা ০১
নারীর সমাজ বাস্তবতা ০১
চলচ্চিত্র ও নারী ০২
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারী ০৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম ও বংশ পরিচয় ০৭
শৈশব ও শিক্ষা জীবন ০৮
সংসার জীবন ১০

তৃতীয় অধ্যায়

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের শুরু ১৩
সুলতানা জামান অভিনীত চলচ্চিত্র ১৫
অভিনয়শৈলীর বিশ্লেষণ ৪১
বেতার ও টেলিভিশনে অভিনয় ৫২
বিজ্ঞাপনচিত্রে অভিনয় ৫২
উপস্থাপনা ৫৩

চতুর্থ অধ্যায়
কর্মযজ্ঞের আরো কিছু দিক ৫৪
চলচ্চিত্র প্রযোজনা ৫৪
পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ ৬০
সাহিত্যকর্ম ৬১
সাংগঠনিক কর্মকান্ড ৭৪

পঞ্চম অধ্যায়
ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য ৭৬
তথ্যচিত্রে সুলতানা জামান ৭৮
স্বীকৃতি-সম্মাননা ৮৩
গণমাধ্যমে সুলতানা জামান সমাচার ৮৬
চলচ্চিত্র থেকে অবসর ৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়
শেষ জীবন ৯৪
নক্ষত্রের পতন ৯৬
সমকালীন প্রতিক্রিয়া ৯৬
স্বজনদের স্মৃতিতে ৯৮
সহকর্মীদের মূল্যায়ন ১০৫

সপ্তম অধ্যায়
সুলতানা জামানের
স্মৃতিময় জীবনের ছবি নিয়ে ছবিঘর ১১৬

অষ্টম অধ্যায়
পরিশিষ্ট
পরিশিষ্ট ক ১৪৮
পরিশিষ্ট খ ১৫০
পরিশিষ্ট গ ১৫৬
পরিশিষ্ট ঘ ১৭০
পরিশিষ্ট ঙ ১৭৫

প্রথম অধ্যায়

শুরুর কথা

সুলতানা জামান তাঁর ডায়েরির পাতায় লিখেছিলেন, 'যদি কোনদিন পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের ইতিহাস লিখিত হয়; তাতে আমার মতো একজন ক্ষুদ্র শিল্পীর নাম কিভাবে উল্লেখিত হবে? স্বর্ণাক্ষরে? সামান্য কালির আঁচড়েও এর উদ্ধৃতি হয়ত থাকবে না। কারণ, ইতিহাস রচনার মত উল্লেখযোগ্য কিছু আমরা করে যেতে পারবো কি?... শুধুমাত্র এইটুকু সান্তনা, অনাগত ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্পের যে প্রাসাদ গড়ে উঠবে বিশাল বিরাটত্ব ও সৌন্দর্য নিয়ে তা গড়ে উঠবে আমাদেরই গাঁথা ভিত্তি প্রস্তরের উপর।

সত্যিই তাই। আজ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এর শুরুটা করেছিলেন তাঁরাই। আর সুলতানা জামানদের নাম কোন দ্বিধা ছাড়াই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের খাতায় স্বর্ণাক্ষরেই লেখা হয়েছে।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক পরিষদে *পূর্ব পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অ্যাক্ট* বিল উত্থাপন করেন। বিলটি পাশ হয়। এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনেকেই আবেদন করেন। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ছবি অনুমোদন লাভ করে। *আসিয়া, আকাশ আর মাটি এবং মাটির পাহাড়*। এর মধ্যে *মাটির পাহাড়* (১৯৫৯) একটি কারণে উল্লেখ্যযোগ্য এই চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী ও কলাকুশলী ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের। এই *মাটির পাহাড়* চলচ্চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুলতানা জামান। তিনি যখন চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, তখন নারীদের জন্য সময়টা ছিলো বৈরী। শুধু চলচ্চিত্রে নয়, পুরো সামাজিক পরিবেশেই নারীরা অবরুদ্ধ ছিলো।

নারীর সমাজ বাস্তবতা

নারীর অবরোধ প্রথা ভেঙে বাইরে নিয়ে আসতে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন লড়াই করেছিলেন। বিরুদ্ধ শক্তিও বসে থাকেনি। নারীদের কেন অবরোধে থাকা উচিত এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে সালাউদ্দিন নামে একজন লিখলেন, 'আমাদের দেশে অবরোধ প্রথা কি কেবল সন্দেহ মূলে প্রচলিত হয়েছে? এই প্রথায় কি স্ত্রীলোকদের কোনো অসুবিধা বা

মনোকষ্ট আছে? এতে কি কোনো প্রকারে মানহানি বা অসম্মানের কারণ হয়ে থাকে? তা কখনোই নয়। বরং এরূপে অন্তঃপুর বাসে তাদের মর্যাদা ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ... স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা বলে যে চিৎকার করা হয়েছে এবং অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে নানা কথা প্রকাশ করা হয়েছে, তাকে পাগলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে!'[১]

এইরকম মনোভাবের মধ্যেই নারীরা ঘর থেকে বেরিয়েছে। সমাজের অগ্রগতিতে অংশ নিতে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। শুরু করেছে পড়ালেখা। যেতে শুরু করেছে স্কুল কলেজে। কিন্তু তাতে কি কম বিপত্তি! শান্তিময় দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন 'কলেজ থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরার বিষয়ে আমরা পদপ্রদর্শক বলে দাবি করতে পারি। কিন্তু তাতেও বাধলো বিপত্তি। পথে বিস্মিত দশর্কেরা দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কেউ নাম ধরে ডাকতে লাগল। কি করে নাম জানল জানি না। সব মিলে এক বিচিত্র ব্যাপার। বাধ্য হয়েই হেঁটে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হলো বেথুন কলেজের ছাত্রীদের। হিন্দু মেয়েরা বোধহয় ১৯৩০ সালের আগে পায়ে হেঁটে পথে বেরোয় নি।'[২]

নাট্যজন ফেরদৌসী মজুমদারও জানালেন তেমন একটি অভিজ্ঞতা। 'আমরা যখন বাড়ির বাইরে যেতাম, মেয়েদের যাতায়াত অত সহজ ছিলো না। রিকশায় ওঠার পর সেটাকে আলাদা কাপড় দিয়ে চারপাশে ঢেকে পথে বেরোতে হতো। আমাদের সে পথের দিশারী ছিলেন রিকশাচালকরাই।'

সকল বাধা ডিঙিয়েই সেই সময় নারীরা ঘর থেকে বের হতে শুরু করেছে। যুক্ত হতে শুরু করেছে বিভিন্ন কাজে। এমনকি বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ ও শিল্প-সংস্কৃতিতে যুক্ত হতে শুরু করেছে সে সময়।

চলচ্চিত্র ও নারী

চলচ্চিত্রে নারীরা অংশগ্রহণ করবে, সেটা যেন ছিল অসম্ভব এক কল্পনা। তাই সেসময় চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্য পতিতা পল্লী থেকে নারীদের নিয়ে আসা হতো। কিংবা পুরুষরাই অভিনয় করতেন নারীর ভূমিকায়।

অনুপম হায়াৎ লিখেছেন, 'ওই সময় কোনো মেয়েই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজী হননি। এ অবস্থায় প্রথম পরীক্ষামূলক নির্বাক স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র *সুকুমারী*তে আবদুস সোবহান নামে একজন পুরুষকে নায়িকা সাজিয়ে অভিনয় করানো হয়েছিলো। ...তারপর নবাব পরিবারের ছবি *দ্য লাস্ট কিস* নির্মিত হয়। এ ছবির বিভিন্ন নারী চরিত্রে যারা ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন অন্ধকার সমাজের বাসিন্দা। কেউ পতিতা, কেউ বাইজি। ছবির নায়িকা লোলিটাকে আনা হয়েছিল বাদামতলির পতিতালয় থেকে। চারুবালা রায়কে আনা হয়েছিল কুমারটুলির পতিতালয় থেকে।'[৩]

কিন্তু চেষ্টা চলছিল সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে নারীদের চলচ্চিত্রে প্রবেশ করানোর। বিজয়রত্ন মজুমদার বলছেন, 'কিন্তু সেদিন আসিবে, না আসিয়া পারে না- যে দিন

বায়োস্কোপে ছবি দেওয়া ভদ্র নারীর পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে। আমি ভুলি নাই, ইহারই মধ্যে দু-একটি ভদ্রনারী পর্দায় উঠিয়াছেন। হয়তো আজ আমাদের মতো দুই চারটি মহাশয় তাহার বা তাহাদের 'ধোপা- নাপিত' বন্ধ করিবার রায় দিয়া দিতে পারি।

কিন্তু যেদিন ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের পরিচালনাধীনে ভদ্রভাবে গঠিত ও সুষ্ঠভাবে চালিত চিত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে সেদিন ভদ্রনারীরা যেমন ঘর, সংসার, স্বামী, পুত্র সব বজায় রাখিয়াও পর্দায় উঠিতে দ্বিধা করিবেন না, সেই রুপ আজ যাহাদের 'ধোপা-নাপিত' অভাবে অপার দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে সেইদিন তাঁহারাই পথ প্রদর্শিকা বলিয়া সমাদৃত হইবেন।'[৪]

সত্যি সত্যি আজ সেই সব অভিনেত্রী পথ প্রর্দশক বলেই বিবেচিত হচ্ছেন, যারা সেসময়ের সমাজের সকল বাধা অতিক্রম করে চলচ্চিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রে আসতে শুরু করেছেন। অগ্রবর্তীদের মধ্যে এই মুহূর্তে বলা যায় কুসুম কুমারী দেবীর কথা।

তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালী চিত্রাভিনেত্রী। কিন্তু তিনি পূর্ববঙ্গের ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের প্রথম চিত্রাভিনেত্রী ছিলেন জ্যোৎস্না গুপ্তা। আর বাঙালি মুসলমান অভিনেত্রী হিসেবে নাম জানা যায় রোকেয়া আহমেদের। *মুখ ও মুখোশ* নির্মাণ হওয়ার পর ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নতুন মাত্রা পায়। এ ছবির নায়িকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হলে অনেক শিক্ষিত নারীও আবেদন করেন। এতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন পূর্ণির্মা সেন, সহনায়িকা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জহরত আরা। সঙ্গে ছিলেন আরো বেশ কিছু নারী। যারা *মুখ ও মুখোশ*-এ অভিনয় করে ইতিহাস হয়ে আছেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারী

বাংলাভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনাপর্ব থেকেই অভিনেত্রীদের অংশ ছিল। তবে প্রায় শতবর্ষ আগের সমাজ বাস্তবতায় নারীর চলচ্চিত্রে অভিনয় সহজ ছিল না মোটেও। সেকারণে নাটকের মতোই প্রথম দিককার চলচ্চিত্রে যেসব নারী অভিনয় করতেন তাদের অনেককেই নিয়ে আসা হতো পতিতালয় থেকে। তাদের কারও পরিচয় ছিল বাঈজী নামে, যারা প্রধানত গান বাজনা করতেন এবং সমাজে কোনো ঠাঁই ছিল না। অন্যরা ছিলেন নিছক যৌনকর্মী পৃথিবীর আদিমতম পেশা- দেহব্যবসায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হওয়া এসব নিগৃহীতারা অনেকেই চলচ্চিত্রে অভিয়ের কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছেন।

এর দৃষ্টান্তপূর্ণ উদাহরণ লোলিটা, যার আসল নাম ছিল বুড়ি। তাকে পুরনো ঢাকার পতিতা পল্লী থেকে বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র *দ্য লাস্ট কিস*- এ অভিনয়ের জন্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। পরে তিনি আবার তাঁর ঠিকানায় ফিরে যান। অবশ্য সেকালে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও কেউ কেউ অভিনয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্না ছিলেন সীতা দেবী।

এদেশী ছায়া-চিত্রে নাম করতে গেলে সর্ব প্রথমেই ভারতের ছায়া-চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সীতাদেবীর নাম মনে পড়ে। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, অভিনেত্রী সুলভ সৌন্দর্য ও অনন্য সাধারণ খ্যাতির কথা শুধু ভারতবর্ষের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহীদের মধ্যেও তাহার যশঃ সৌরভ ছড়াইয়া পড়িয়াছে সুদূর জার্মানি, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও পোল্যান্ড-এ শতমুখে প্রশংসিত হইতেছেন...

সীতাদেবী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে।.... *এশিয়ার আলো*'র কাজ শেষ করিয়া সীতাদেবী নিরঞ্জন পাল লিখিত *দেবী* (Goddes) নামক নাটকের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাহার পর ১৯২৬ সালে তিনি আবার ফিল্মে অভিনয় করেন। ১৯২৬ সালের প্রথম ভাগে তিনি ম্যাডান থিয়েটারস্ লিঃ এর চাকুরি গ্রহণ করেন। এই থিয়েটারের ৪টি ফিল্মে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন, এই ৪টি ফিল্মের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইল-ই ভালো হয়েছিল।

অবিভক্ত বাংলার চলচ্চিত্রে বাঙালি নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত পরের ঘটনা। তবে পূর্ববঙ্গে নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রথম অভিনেত্রীকে ঢাকা শহরের পতিতা পল্লী থেকে আনা হলেও অবিভক্ত বাংলার প্রথম অভিনেত্রী ছিলেন তুলনামূলকভাবে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে যে নারী প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন তার নাম জ্যোৎস্না গুপ্তা। উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেনের ভাগ্নে ভোলানাথ গুপ্ত ছিলেন তার বাবা। হীরালালের বাড়ি যে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের বগজুড়ি গ্রামে ছিল তা আমরা জানি। কুমার গুপ্তের নিবাসও ছিল মানিকগঞ্জে। তিনি অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃত ছিলেন। হীরালাল সেনের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গে ১৯৯৫ সালে ৩০ ডিসেম্বর সংখ্যা আনন্দলোক পত্রিকায় বারিদ বরণ ঘোষ খুব মূল্যবান তথ্য দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন - পৃথিবীতে যখন সিনেমা দেখানো শুরু হলো, তখন থেকে হিসেব করলে বাংলা ভাষাতে ছবি তোলার ইতিহাস খুব একটা তফাতে গড়ে ওঠেনি। এটা বোধহয় গৌরবের কথাই। আর বিশ্বের আদি পর্বের ছবির মতই বাংলা চলচ্চিত্রের আদি পর্বও নির্বাক। কিন্তু তার ইতিহাস নির্বাক নয়।

১৮৯৬ সনে কলকাতার থিয়েটার পাড়ায় স্টিফেন্স (স্টিভেনসন সাহেব) বলে এক বিদেশী এসে স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কাছে এসে প্রস্তাব করলেন- তিনি একটা

দারুণ মজার জিনিস সঙ্গে এনেছেন - দেখে শুনে স্টার থিয়েটারের মালিক পক্ষ দারুণ খুশি। তারা রাজি হয়ে গেলেন। হ্যান্ডবিল দেখে হাজার হাজার লোক আসতে লাগলেন। জমে গেল বাজার, কলকাতা এক নতুন জিনিস দেখল এবং এসব দেখে শুনে হাইকোর্টের উকিল চন্দ্র মোহন সেনের দুই ছেলে হীরালাল ও মতিলালের মাথায় পোকা নেচে উঠল। বিশেষ করে হীরালাল মায়ের কাছে টাকা নিয়ে বিদেশ থেকে ছবি তোলার ব্যবস্থা করলেন। প্রথম বাঙালি অপারেটর ভোলানাথ গুপ্ত ওরফে কুমার শঙ্কর গুপ্তও সঙ্গে এলেন। অক্সিজেনের লাইম লাইট দিয়ে ছবি তুলে ফেলল সেন ব্রাদার্স - পরে এর নাম হল *রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি* - বাঙালির প্রথম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নিখিল ভারতে শিল্প প্রদর্শনী দেখে অবাক হয়ে লোকে দেখল এদের পরিবেশিত আশ্চর্য ছবি নড়ছে-চড়ছে-হাসছে-কাঁদছে। ছবি দেখে গেলেন ভাওয়ালের রাজা, বেনেলির রাজ বাহাদুর প্রমুখ। শহর জুড়ে হৈ চৈ। এদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ক্ল্যাসিক রঙ্গমঞ্চের নট-নাট্যকার এবং মালিক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের। তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে হীরালাল তাঁর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ছবি কখনও সীতারাম কখনও আলিবাবা নাটকের নির্বাচিত অংশের ছবি তুলে নেন। বাঙালির তোলা প্রথম নির্বাক ছবি ছিল এ ধরনেরই। বিজ্ঞাপন ছাপা হতে লাগল এইসব 'সুপার ফাইন' ছবি বা বায়োস্কোপের। বিভিন্ন ভাষায় এমনি একটা বাংলা বিজ্ঞাপন ছাপা হল- 'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য! দেখুন যাহা কেহ কখনও কল্পনা করেন নাই, তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ছবির মানুষ জীবন্ত, জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় হাটিয়া, চলিয়া বেড়াইতেছে, চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে'। এসব অভিনয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম অংশগ্রহণ করেছেন কুসুম কুমারী, প্রমদা সুন্দরী, হরিদাসি(গুফন হরি) বা তারা সুন্দরীরা।

এখানে যে কুসুম কুমারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাকে প্রথম বাঙালি চিত্রাভিনেত্রী হিসাবে অনুপম হায়াতও উল্লেখ করেছেন। সেখানে অনুপম হায়াৎ লিখেছেন, 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃৎ হীরালাল সেন চলচ্চিত্র শিল্পে প্রথম বাঙালি মহিলা অভিনেত্রী আনারও পথিকৃত তিনি। ১৯০০-১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ক্লাসিক্যাল থিয়েটার 'আলিবাবা' নাটকের খ- দৃশ্যে মরজিনা চরিত্রে রূপদানকারী কুসুম কুমারীর নৃত্য দৃশ্য চিত্রায়ণ করেন। এই হিসেবে কুসুমকুমারী হচ্ছেন প্রথম বাঙালি চিত্রাভিনেত্রী কিন্তু কুসুম কুমারী পূর্ব বঙ্গের ছিলেন না।

যখন নারীরা সবেমাত্র চলচ্চিত্রে আসা শুরু করেছে, তখন সকল বাধাবিপত্তি এক মুহূর্তে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। তাই যখন সুলতানা জামান *মাটির পাহাড়ে* অভিনয় করলেন, তখন তিনি হলেন রাজিয়া। তিনি নিজেই বলেছেন, সেই অভিজ্ঞতার কথা। '৫৭-এর মার্চ মাসে শুটিং শুরু হল। প্রথম দিনের শুটিং প্রথম শটেই "ওকে" হল। অভিনয় তো করে যাচ্ছি। এদিকে আমার ভিতরে ভয় ঢুকে গেছে। বাবা জানলে কী অবস্থা হবে! আমি বললাম, ঠিক আছে অভিনয় তো করছি। এ মুহূর্তে আমার যেন

কোনো পাবলিসিটি না হয়। জামান সাহেব বললেন, কোনো অসুবিধা হবে না।'[৫]
কয়েকদিন পরে দেখি 'চিত্রালী'র প্রথম পাতায় আমার বিরাট এক ছবি। জামান সাহেব আমাকে বোঝালেন যে ছবি ছাপা না হলে মানুষ জানবে কেমন করে? ছবিতো সিনেমা হলে চালাতে হবে। ছবি ছাপা হলো রাজিয়া নামে। আমি তখন রাজিয়া নামে অভিনয় করছি।'[৬]
তিনি তাঁর প্রতিকূলতার কথা বলেন এভাবে 'তখন মেয়েদের চলচ্চিত্রে অভিনয় করাটাকে ভালো চোখে দেখা হতো না। অসামাজিক ভাবা হতো। বিশেষ করে, মুসলিম সমাজে। সেই প্রতিকূলতার মধ্যে আমার চলচ্চিত্রে আসা। যদিও নিজের ইচ্ছাতে নয়। নির্মাতাদের আগ্রহে।
কিন্তু আমি একটা বিষয় ফিল করতাম। চলচ্চিত্র তো সমাজেরই অংশ। সেখানে সমাজচিত্রের প্রতিফলন ঘটে থাকে। সুতরাং সেখানে কাজ করাটা অমর্যাদাকর হবে কেন?'[৭]

তথ্য সূত্র

১. ১৯৭ পৃষ্ঠা, মালেকা বেগম ও আজিজুল হক, আমি নারী, তিনশ বছরের নারীর ইতিহাস, ঢাকা, ইউপিএল, ২০০১।
২. ১৯৬ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত।
৩. অনুপম হায়াৎ, পৃষ্ঠা ২৯৬, নারী ও চলচ্চিত্র, ঢাকা নগর জীবনে নারী, সোনিয়া নিশাত আমীন সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন ২০১০।
৪. অভিনেত্রী কথা, ৮৪ পৃষ্ঠা বায়োস্কোপ, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৩০।
৫. অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের কয়েকজন চলচ্চিত্রকর্মী, পৃষ্ঠা ৬৪।
৬. সুলতানা জামান, আমার কথা, পৃষ্ঠা ১৭, তারকালোক ঈদ সংখ্যা ১৯৯১।
৭. সাক্ষাৎকার, জনকণ্ঠ, ২০ ডিসেম্বর, ২০০১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম ও বংশ পরিচয়

সুলতানা জামানের পারিবারিক নাম সৈয়দা হোসনে আরা শরিফা বেগম। জন্ম নাটোরে। জন্মসাল ও তারিখ নিয়ে বিভিন্ন তথ্যে ভিন্ন ভিন্ন সাল তারিখের উল্লেখ পাওয়া গেছে।

যেমন: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২৫ বছর রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ- প্রকাশকাল ৮ই জুন ২০০৪ -এ *আমি অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের ইমেজ ধরে রেখেছি* শিরোনামে সুলতানা জামান বলেন, 'জন্ম ১৯৩৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর নাটোর শহরে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে নাটোরে।' আবার একই জার্নালের ২০১২ সংখ্যার ১৩৮ নং পৃষ্ঠায় *প্রধানমন্ত্রীর হাতে থেকে পুরস্কার নিতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি* শিরোনামে দেখা যায়, '১৯৪০ সালে ১০ আগস্ট তিনি ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতানা জামানের দাদা ছিলেন ফরিদপুর রুক্মিনি স্টেটের জমিদার।' আবার কালের কণ্ঠ ২৮ জুলাই ২০১১ তে *নাজির আহমেদ আমাকে মিনাকুমারী বলে ডাকতেন* শিরোনাম সৌমিক হাসান সোহাগ লেখেন '....জন্ম ১৯৩৮ সালে নাটোর শহরে মিরপাড়ায়।' অন্যদিকে দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ মে ২০১৪ তে *চলে গেলেন অভিনেত্রী সুলতানা জামান* শিরোনামে ইমরান হোসেন খান '১৯৪০ সালের ১০ আগস্ট তিনি ফরিদপুর জন্মগ্রহণ করেন' বলে উল্লেখ করেছেন।

সুলতানা জামান নিজে তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে তারকালোক, ঈদ সংখ্যা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১৫ তে বলেন, *আমার কথা* শিরোনামে তিনি বলেন, 'আমার জন্ম নাটোরে। তারিখ বাংলা মাসের ১০ ভাদ্র। বর্ষাকাল। সনটার কথা না-ই বললাম।' আবার তাঁর ছেলে শরীফুজ্জামান বাপী জানান, তাঁর মা সুলতানা জামানের জন্ম ১৯৪০ সালের ২৫ আগস্ট।' এই বক্তব্যের সঙ্গে তারিখ ১০ ভাদ্র ইংরেজি ২৫ আগস্ট-ই। তাই তারিখটা কিছুটা অনুমেয়।

তবে সুলতানা জামান যে সালেই জন্মগ্রহণ করুন, তাঁর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে যে তাঁর মাতৃভূমি গর্বিত হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। তাঁর মতো অসামান্য শিল্পীর জন্ম না হলে হয়তো চলচ্চিত্রের ইতিহাস অসম্পূর্ণ-ই থেকে যেত।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রকাশনা

১। অভিনয়শিল্পী সুলতানা জামান : জীবন ও কর্ম, সুচিত্রা সরকার, ঢাকা, ২০১৪।
২। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, মোঃ রাজিবুল হাসান, ঢাকা, ২০১৪।
৩। বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, জান্নাতুল ফেরদৌস জুমা, ঢাকা, ২০১৪।
৪। কুশলী চিত্রগাহক বেবী ইসলাম, মীর শামছুল আলম বাবু, ঢাকা, ২০১৩।
৫। তারেক মাসুদ : জীবনী গ্রন্থ, রুবাইয়াৎ আহমেদ, ঢাকা, ২০১৩।
৬। লালনের জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্রে লালন দর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন, নন্দিতা তাবস্সুম খান, ঢাকা, ২০১৩।
৭। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন : পটভূমি, আদর্শ, লক্ষ এবং কার্যক্রম (১৯৬১-২০১১), অব্যয় রহমান, ঢাকা, ২০১৩।
৮। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ, ড. কাবেরী গায়েন, ঢাকা, ২০১২।
৯। এম. এ. সামাদ : জীবন ও কর্ম, ড. রশিদ হারুন, ঢাকা, ২০১২।
১০। বাদল রহমান : জীবন ও কর্ম, আবু সাইদ মেহেদী হাসান, ঢাকা, ২০১২।
১১। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ. কে. এম. আব্দুর রউফ, স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ২০১১।
১২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র : অনুপম হায়াৎ, ঢাকা, ২০১১।
১৩। বাংলাদেশের ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যলোচনা : মোঃ রফিকুল ইসলাম, ঢাকা, ২০১১।
১৪। বাংলাদেশের লোককাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্রে লোকজীবনের উপস্থাপনা : ড. তপন বাগচী, ঢাকা, ২০১১।
১৫। আমাদের চলচ্চিত্র : মোঃ ফখরুল আলম, ঢাকা, ২০১১।
১৬। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা: ড. মো: আমিনুল ইসলাম, ঢাকা, ২০১১।
১৭। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচিতি : ঢাকা, ২০১১।
১৮। চলচ্চিত্রকার সালাহউদ্দিন : হারুনর রশীদ, ঢাকা, ২০১১।
১৯। সুমিতা দেবী : অব্যয় রহমান, ঢাকা, ২০১১।
২০। উদয়ন চৌধুরী : সুহৃদ জাহাঙ্গীর, ঢাকা, ২০১১।
২১। চলচ্চিত্রের গানে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : তপন বাগচী, ২০১০।
২২। Digital Film of Bangladesh, Dr. Fhamidul Huq, Dhaka, 2010.
২৩। Women on Screen : Representing Women by Women in Bangladesh Cinema, Bikash Ch. Bhowmick, Dhaka, 2009.
২৪। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব : বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা : অদিতি ফাল্গুনি গায়েন ও হুমায়রা বিলকিস, ঢাকা, ২০০৯।
২৫। বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা : তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস, ঢাকা, ২০০৯।
২৬। রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০০৪।
২৭। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৭ম সংখ্যা, ২০১৪।
২৮। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০১৩।
২৯। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৫ম সংখ্যা, ২০১২।
৩০। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১।
৩১। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, ২০১০।
৩২। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ২য় সংখ্যা, ২০০৯।
৩৩। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১ম সংখ্যা, ২০০৮।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
বেতার ভবন (৩য় তলা), ১২১ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। www.bfa.gov.bd